Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501037

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Rabindra Sangeet and Medieval Classical Music
রবীন্দ্রসংগীত ও মধ্যযুগের শাস্ত্রীয় সংগীত

Amit Kumar Patra
Assistant Professor
Music Department, Mahishadal Girls College
Purba Medinipur

Received on: 29th April 2026
Accepted on: 18th May 2026

Abstract:
India is considered a sacred centre of musical practice. It is often said that studying Indian classical music enables one to understand and master music from any part of the world. This classical tradition has many distinct styles or forms. Rabindranath Tagore grew up in a rich musical environment where classical music was widely practiced. Renowned musicians from various gharanas frequently visited the Tagore household to perform. From a very young age, Tagore was exposed to classical music through listening and learning.

He also had the opportunity to learn from many accomplished musicians, who served as his gurus and helped him develop a clear understanding of classical music. This deep connection significantly influenced his compositions. In his songs, Tagore sometimes imitated, sometimes followed, and at other times expressed his own originality.

This article discusses several classical forms — Dhrupad, Dhamar, Tappa, and Thumri — and highlights the extent of classical music practice in the Tagore household. It also explores how Tagore became connected to these styles and how they influenced his work. The article mentions the fundamental songs, ragas, and talas associated with these traditions, along with examples of Tagore's compositions that were inspired by them.

Key Words:
Tagore household's musical tradition, medieval music, Dhrupad, Dhamar, Khayal, Tappa, Thumri.

মূল প্রবন্ধ

শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কের সূত্রপাত হয় সেই বাল্যকাল থেকেই। খুব ছোটো থেকেই নানা শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর তিনি শুনেছেন। তবে তার বহু আগে থেকেই ঠাকুর পরিবারে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা শুরু হয়েগিয়েছিল। দ্বারকানাথের পিতা রামলোচন ঠাকুর প্রায়শই সে-যুগের বিখ্যাত শাস্ত্রীয় শিল্পীদের নিজের বাড়িতে আহ্বান জানাতেন। এই সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথ সংগীতের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর 'বেলগাছিয়া ভিলা' নামক উদ্যানবাটীতে নিয়মিত গীত ও নৃত্যের আয়োজন করা হতো। তিনি ইউরোপীয় সংগীতেরও একজন সমঝদার শ্রোতা ছিলেন। মাক্সমূলার সাহেব দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কে একটি পত্রে বলেছেন — "তিনি অত্যন্ত সংগীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইতালীয় ও ফরাসী সংগীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন আর আমি সেই গানের সঙ্গো পিয়ানো বাজাতাম — এই ভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন।... দ্বারকানাথকে এই কথা বলায় তিনি বলেন — 'তোমরা সকলেই এক রকমের। যদি কোন জিনিস

© Santiniketan Sahityapath

তোমাদের কাছে নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তোমরা অমনি তার প্রতি বিমুখ। প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন আমিও তাতে কোন রস পাইনি, কিন্তু তবু আমি ক্ষান্ত হইনি; আমি ক্রমাগত চর্চা লাগলাম যতক্ষণে না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম। সকল বিষয়েই এইরূপ। তোমরা বল আমাদের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়। ইউরোপ যাহা প্রকাশ করে আমরা চেষ্টা করি তাহা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গাম করতে, কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ যাহা প্রকাশ করে তাকে অবহেলা করি না। আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীতবিদ্যা, কাব্য, দর্শন আলোচনা করি, তোমরাও যদি তাই করতে তাহলে তোমরাও আমাদের দেশের বিদ্যাগুলির মর্ম বুঝতে পারতে এবং আমাদের যে অজ্ঞ ও ভণ্ড মনে কর, বাস্তবিক আমরা তা নই, বরং অজ্ঞাত বিষয়ে তোমরা যা জান, আমরা হয়ত তারো অধিক জানতে পেরেছি দেখতে।' বাস্তবিক তিনি নিতান্ত ভুল বলেন নি।"[১]

ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চা:

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকেই ঠাকুরবাড়ির সংগীত চর্চা এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৩ সালে। সংগীতের প্রতি তাঁর যে অপরিসীম প্রেম, তা তাঁর পরবর্তী পুত্রপৌত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং ঠাকুরবাড়িতে এক নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে। রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসংগীত রচনায় উৎসাহিত হয়ে তিনি নিজে তো ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেনই, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রদেরও বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। একসময় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সংগীতের পীঠস্থানে পরিণত হয় দেবেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বাংলার বাউল, কবিগান, কীর্তন প্রভৃতি সংগীত ধারার প্রতিও অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁর পরিবারের ছেলেদের সংগীতে সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ গায়কদের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।

বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতের শিক্ষা শুরু হয়। ধ্রুপদ এবং খেয়াল উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই দুই প্রকার গীতরীতিতেই বিষ্ণু চক্রবর্তী অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাংলা ছড়ার উপর রাগরাগিণীর সুর বসিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতকে বালকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাগ-রাগিণীর পরিচয় খুব সহজেই হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনের অনেক ওস্তাদেরা শিক্ষণের এই পদ্ধতিকে পছন্দ না করলেও বিষ্ণু চক্রবর্তী গানের ক্ষেত্রে খুবই উদারপন্থী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সংগীতশিক্ষক ছিলেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু। তিনি ছিলেন সংগীত পাগল একজন মানুষ। তিনি ওস্তাদের মতন বাঁধাধরা নিয়মে গান শেখাতেন না। তিনি তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করতে বলতেন এবং কখন যেন ছোট্টো রবির কণ্ঠে গানগুলি উঠে যেত। এরপর ঠাকুরবাড়িতে প্রসিদ্ধ গায়ক যদুভট্টের আগমন ঘটে। রবীন্দ্রনাথের সুমিষ্ট কণ্ঠ এবং কম সময়ে গান তুলে নেবার ক্ষমতা দেখে যদুভট্ট তাঁকে গান শেখানোর জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর কাছে শেখা কিছু গানের সুর ও তাল অবলম্বন করে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু গান রচনা করেছেন, যেমন, 'শূন্য হাতে ফিরি হে', 'আজি বহিছে বসন্ত পবন', 'জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি' প্রভৃতি। যদুভট্টের পর গোয়ালিয়রের মৌলা বক্স ঠাকুরবাড়িতে সংগীতের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি প্রতিদিন বালকদের খুব ভোরে উঠিয়ে তানপুরার সঙ্গে সংগীতচর্চা করাতেন। এর পরে ঠাকুরবাড়িতে শিক্ষক হয়ে আসেন রাধিকাপ্রাসাদ গোস্বামী, যিনি গোয়ালিয়রের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। রাগের ভাণ্ডারী বলা হতো তাঁকে। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ যেমন গান শিখেছেন, তেমনি গান রচনা করার উৎসাহও পেয়েছেন অনেক। খুব ছোটো থেকেই শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। এখানে তাঁর একটি উক্তি উল্লেখ করব — "সংগীত মাত্রই শৌরি মিঞার পদানুবর্তী নয়। অধিকাংশ ধ্রুপদ গানে বাক্যে ঠাস-বুনানির মধ্যে অলংকারবাহুল্য স্থান পায় না, শোভাও পায় না। এই স্বর সংযমে তার গৌরব বাড়িয়েছে। ধ্রুপদের এই বিশেষত্ব।"... "বাংলাদেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত, তারি অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে বুঝি নে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুব পদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষিদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণ সহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাগ বাগ্ বিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইহা করলেও সেই সংগীতকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নে; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না।"[২]

এতো গেল তাঁর সংগীত শিক্ষা। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা সংগীত ঘরানার বড়ো বড়ো ওস্তাদদের গান শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরিণত বয়সে বিভিন্ন ধারার লোকসংগীত এবং পাশ্চাত্য সংগীতের সুর তাঁর সংগীত সৃষ্টিতে প্রভাব ফেললেও, তাঁর সমগ্র সংগীতসম্ভারের সুর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শাস্ত্রীয় সংগীত বা রাগসংগীত তাঁর সৃষ্টিতে সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে রাগসংগীতকে বিভিন্নভাবে ব্যাবহার করেছেন, কখনো সময় হিসাবে বা কখনো ঋতু হিসাবে। যেমন যেসব গানে ভোরের, আলোর, শুবু বা জাগরণের কথা আছে সেখানে প্রভাতকালীন রাগ এবং যেখানে দিন অবসান, সন্ধ্যা, সমাপ্তি প্রভৃতির কথা বা ভাব আছে সেইসব গানে তিনি পূরবী বা মূলতানী রাগের ব্যবহার করেছেন। বর্ষা ঋতুর গানে তিনি মল্লার, দেশ প্রভৃতি রাগ ব্যবহার করেছেন। এছাড়া উৎসব বা বসন্তের গানের সুরে রাগ বাহার; এইভাবে যেখানে যে ভাব প্রয়োজন সেখানে প্রয়োজন মতো শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে সেই সুর গ্রহণ করেছেন। তবে যেখানেই তিনি প্রচলিত শাস্ত্রীয় নিয়মকে বন্ধন বলে মনে করেছেন তখনই তিনি তা ভেঙে দিয়েছেন, মিশ্রণ ঘটিয়েছেন নূতনের। ঋতুর গানে তিনি যে সবসময় ঋতুকালীন রাগই ব্যবহার করেছেন তাও নয়, ভাব প্রকাশের অনুকূল সুরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সবসময়। প্রাচীন শাস্ত্রীয় সংগীতের ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী থেকে যেমন অজস্র রাগের সৃষ্টি হয়েছে, সেই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদেরই উত্তরসূরী। তিনি তাঁর প্রথম জীবনে ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতির সুরের অনুকরণে অনেক গান রচনা করেছেন। তিনি কোথাও কোথাও শাস্ত্রীয় সুরকে গ্রহণ করেছেন, কোথাও সুর ও তাল দুটোই গ্রহণ করেছেন, কোথাও অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়েছেন এবং নিজের মনের কল্পনা, মাধুরী সুরে-ছন্দে মিশিয়ে নিজের এক একটি গান সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের আবহে সৃষ্ট গানগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। সেই ধারাগুলি হলো —

১। ধ্রুপদ-অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত

২। ধামার-অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত

৩। খেয়াল-অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত

৪। টপ্পা-অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত

৫। ঠুংরী-অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত

এই শাস্ত্রীয় ধারাগুলির সম্পর্কে এবং তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গানে কতটা পড়েছে তা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

ধ্রুপদাঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত:

প্রাচীন ভারতে বিভিন্নপ্রকার প্রবন্ধগীতির প্রচলন ছিল। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' অনিবন্ধ এবং বন্ধ এই দুই প্রকার প্রবন্ধগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধগীতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় শারঙ্গদেবের 'সংগীত রত্নাকর', মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী', পার্শ্বদেবের 'সংগীতসময়সার' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। শারঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে এই প্রবন্ধগীতিগুলির দুটি শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায় — একটি হলো শুদ্ধ এবং অপরটি সালগ। তিনি ষোলটি শুদ্ধ প্রবন্ধগীতির উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি সালগ প্রবন্ধগীতিগুলিকে সাতটি প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি — ধ্রুব, মনঠ, প্রতিমনঠ, অর্ধতাল, নিশারুক, একাদশী এবং রাসক। তাঁর এই সালগ সূঢ় শ্রেণির প্রবন্ধগীতিগুলিই পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ সংগীতের রূপ গ্রহণ করে। মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী'তে সাতটি প্রবন্ধগীতি বা রাগগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রাগগীতিগুলি হলো — শুদ্ধা, ভিন্ন বা ভিন্নকা, রাগগীতি, গৌরী বা গৌরীকা, সাধারণী, ভাষা এবং বিভাষা। অবশ্য ভিন্ন মতও আছে। পার্শ্বদেব এগারো প্রকার ধ্রুবগীতির উল্লেখ করেছেন তাঁর 'সংগীতসময়সার' গ্রন্থে।

খ্রিস্টিয় চতুর্দশ-পঞ্চাদশ শতকে আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালে নায়ক গোপাল, বৈজনাথ বা বৈজুবাওরা এবং আমীর খসরু এই তিনজন সংগীত শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের সে এক গৌরবময় অধ্যায়। অনেকে মনে করেন বৈজুবাওরা চার তুক বিশিষ্ট (স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ) ধ্রুপদ গীতরীতির প্রচলন করেছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে পরবর্তীতে গোপাল নায়কও বহু ধ্রুপদ সংগীত রচনা করেন। প্রাচীন ধ্রুপদ গানে রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল, সাত্তিতাল, লক্ষ্মীতাল, মত্ততাল ইত্যাদির ব্যবহার ছিল। এরপর খ্রিস্টিয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালকে ধ্রুপদ সংগীতের স্বর্ণযুগ শুরু হয়। তামাম ভারতের সংগীতগুণীদের সঙ্গে তানসেনও ছিলেন আকবরের সভাসদ। আর এই বিভিন্ন অংশের গাইয়ে বা বাজিয়েদের নিজস্ব এক-একটা ঢং বা স্টাইল ছিল। এই নিজস্ব গায়কী বা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সেই সময়ে ধ্রুপদের চার প্রকার গীতরীতি বা গায়নপদ্ধতির প্রচলন হয়।

© Santiniketan Sahityapath

এই রীতিগুলো হলো — গৌড়ীয় বাণী, খাণ্ডার বাণী, ডাগর বাণী এবং নওহর বাণী। শাস্ত্রীয় সংগীতের 'ঘরানা' শব্দটি গুরু-শিষ্য পরম্পরা বা গায়কীধারার পরিচায়ক হলেও আসলে তা বিভিন্ন গীতরীতি বা গায়নশৈলী থেকেই উদ্ভব হয়ছে। আকবরের সমকাল থেকেই অধিকাংশ ওস্তাদেরা প্রত্যেকে কোনো-না-কোনো ঘরানা বা গায়কীরীতিকে অনুসরণ করেছেন। এরকমই একটি ঘরানা 'বিষ্ণুপুর ঘরানা', যার গীতরীতি বা style রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। অন্যান্য ক্লাসিক্যাল পদ্ধতির ধারাগুলির মধ্যে ভারতীয় ধ্রুপদ সংগীতই রবীন্দ্রনাথের সব থেকে বেশি পছন্দের ছিল। একথা তাঁর নিজের উক্তি থেকেই জানা যায় — "আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি — একদিকে তার বিপুল গভীরতা, আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করে। এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহু কক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহু চিত্র বৈচিত্র্য ঘটুক, তাহলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে।"[৩]

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানে সুরের সঙ্গে সঙ্গে বাণীরও সমান গুরুত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথও গানের বাণী ও সুরের সমান মর্যাদা অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর রূপই পছন্দ করতেন। তাই তিনি বলেছেন — "বাংলায় নতুন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে সেই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে বাংলা সংগীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলন সাধনে ধ্রুব পদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে — আর অনিন্দনীয় কাব্য মহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে।"[৪] সাধারণত ধ্রুপদের চারটি অংশ বা তুক থাকে — স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্রুপদ-অঙ্গের গানে ধ্রুপদ সংগীতের গীতরীতির পরিবর্তন না করে এই চার তুকেরই ব্যবহার করেছেন। তবে ধ্রুপদের কিছু গানে দুই তুকের (স্থায়ী ও অন্তরা) ব্যবহারও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই চার তুকের ধ্রুপদ গানই বেশি পছন্দ করতেন, কারণ এখানে সংগীতের সাহিত্যরস ফুটিয়ে তোলার সুযোগ অনেক বেশি থাকে। রবীন্দ্রনাথের সমকালে শাস্ত্রীয় ধ্রুপদে সাধারণত চৌতাল, আড়া-চৌতাল, সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতাল, তেওড়া প্রভৃতি তালের ব্যবহার ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গের গানেও এই সমস্ত তালগুলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ধ্রুপদ গানে যে গমকের ব্যবহার প্রচলিত আছে তা তাঁর গানেও লক্ষ করা যায়। সংগীতে মানানসই অলংকার তিনি পছদ করতেন, তবে যেখানে গীতরূপ বা ভাবরূপ নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে সেখানে অলংকারের আধিক্যকে তিনি সর্বদা বর্জন করেছেন। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ সংগীতে দ্বিগুণ — চারগুণ লয়কারী, অতিতগ্রহ, অনাতগ্রহ ইত্যাদির ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বর্জন করেছেন। অলংকারবাহুল্য সংগীতের প্রকৃত রূপকে ঢেকে দেয়, তাই এটিকে তিনি বলতেন — 'কারদানী'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্রুপদ-প্রকৃতির গানগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় —

১। মূল হিন্দুস্থনী ধ্রুপদ সুরের অনুকরণে রচিত ধ্রুপদ সংগীত

২। স্বকীয় — প্রতিভাসৃষ্ট ধ্রুপদ প্রকৃতির সংগীত

মূল হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের অনুকরণ বলতে বোঝানো হয়েছে যে কোনো খ্যাতনামা ওস্তাদের রচিত এবং সুর সংযোজিত সংগীতকে অনুসরণ বা অনুকরণ করা। এমন রবীন্দ্রসংগীত অনেক আছে যেখানে তিনি হুবহু অনুকরণও করেছেন। আবার ধ্রুপদের সুরকে অনুসরণ করে রচনা করা হলেও মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে অনেক পার্থক্য আছে এমন রবীন্দ্রসংগীতও আছে। এই প্রকার গানে ধ্রুপদের বাণীর একটা স্বতন্ত্র পরিণত রূপ তো আছেই। এছাড়া সুর, তাল, লয়ের প্রকাশভঙ্গির দিক থেকেও মূল ধ্রুপদের সঙ্গে এর বিপুল পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভাসৃষ্ট ধ্রুপদ-অঙ্গের গানের সংখ্যাও অনেক। এই গানগুলিতে কথার অভিনবত্ব, সুর সংযোজন মাধুর্যে তাঁর সৃজন প্রতিভার প্রমাণ মেলে, তবে শাস্ত্রীয় সংগীতে অনুসৃত রাগ ও তালকে তিনি ব্যবহার করেছেন। এই গানগুলিতে প্রাচীন কিংবা হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ সংগীতের অনুকরণের কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কিছু গানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেখানে তিনি শাস্ত্রীয় ধ্রুপদের অনুকরণ বা অনুসরণ করেছেন —

চৌতাল:

রবীন্দ্রনাথের গান	মূল গান	রাগ	স্বরবিতান সংখ্যা
অসীম আকাশে অগণ্য	সকল গুণ প্রকাশ	মারুকেদারা	২৫
আইল শান্ত সন্ধ্যা	ভাওএরে ভস্ম	শ্রীরাগ	৪৫
আছ অন্তরে চিরদিন	কৈসে অব ধর ধীর	কাফি	২২
আনন্দ রয়েছে জাগি	আজু রচো করতার	হাম্বীর	৪
এ ভারতে রাখ	এ বাতিয়া মোরে	সুরট	৪, ৪৭
গহন ঘন ছাইল	ইন্দ হুঁকী আসবরী	গৌরমল্লার	১১
তুমি জাগিছ কে	তুম নয়ন মে	গৌড়	২৬
পূর্ণ আনন্দ	পূর্ণ ব্রহ্ম	ইমন-কল্যাণ	২২
বাণী তব ধায় অনন্ত	বেণী নিখরত ভুজঙ্গ	আড়না	২৪
শক্তিরূপ হেরো তাঁর	সপ্তসুর তিন গ্রাম	ইমন	২২
স্বামী, তুমি এসো আজ	সাঁই তো ন আওয়ে আজ	বেহাগ	২৭
হে মহাপ্রবল বলী	হে মা প্রবল বলী	কানাড়া	২৭

সুরফাঁকতাল:

আনন্দ তুমি স্বামী	ওঙ্কার মহাদেব	ভৈরবী	২৭
দাঁড়াও মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড	হেরি তব আনন্দ	ভীমপলশ্রী	৩৬
দেবাদিদেব মহাদেব	দেব দেব মহাদেব	দেওগিরি	২৩
প্রচণ্ড গর্জনে আসিল	প্রচণ্ড গর্জন	ভূপালী	২৫
প্রথম আদি তব শক্তি	প্রথম আদি শিবশক্তি	দীপক পঞ্চম	৩৬
বাজাও তুমি কবি	আয়ে ঋতুপতি	বাহার	৪
ভক্ত হৃদি বিকাশ	শম্ভু হর মহেশ	ছায়ানট	৪
শূন্য হাতে ফিরি হে	ঝুম ঝুম বরখে	কাফি	৪
সুন্দর বহে আনন্দ	শঙ্কর শিব পিনাকী	ইমন কল্যাণ	২৩

ঝাঁপতাল:

নিত্য তব সত্য তব	জ্ঞানরঙ্গা ধ্যানরঙ্গা	শুক্ল বিলাবল	২২
নিত্য সত্যে চিন্তন	কালী নাম চিন্তন	আড়ানা	২৪
বহে নিরন্তর অনন্ত	দুসহ দোখ দুখ দলনী	লচ্ছাসার	২২
মধুর রূপে বিরাজো	কৌনরূপ বনে হো	তিলক কামোদ	৪

তেওড়া:

আজি বহিছে বসন্ত পবন	আজু বহত সুগন্ধ পবন	বাহার	২৩
জয় তব বিচিত্র আনন্দ	জয় প্রবল বেগবতী	বৃন্দাবনী সারং	৩৬
বিপুল তরঙ্গ রে	নাচত ত্রিভঙ্গ য়ে	ভীমপলশ্রী	২৫
মহাবিশ্বে মহাকাশে	মহাদেব মহেশ্বর	ইমন কল্যাণ	৪
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	দুষ্ট দুর্জন দূর কর দেবী	ইমন কল্যাণ	২৩

এবার সেই গানগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন যেগুলি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভায় সৃষ্ট কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রভাবিত ——

সুরফাঁকতাল:

স্বরূপ তার কে জানে	কেদারা	২৭

ঝাঁপতাল:

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা	আলাইয়া	২৩
মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ	ভৈরবী	৮
সদা থাকো আনন্দে	খট	৪
এ কী সুগন্ধ হিল্লোল বহিল	মিশ্র যোগিয়া	২৩
মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে	আশাবরী	২৭

তেওড়া:

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু	আশা ভৈঁরো	২২
ধনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর	মিশ্র রামকেলী	১৩
মহানন্দে হের গো সবে	তিলক কামোদ	৪
আমার প্রাণের গভীর গোপন	মেঘ	৩
আমার বিচার তুমি করো	কেদারা	২৬
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে	বেহাগ	২২
নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে	বাগেশ্রী	২২

ধামার-অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত:

ধামার হলো একটি তালের নাম। এই শ্রেণির সংগীত ধামার তালে গাওয়া হয় বলে এমন নামকরণ হয়েছে। এই তালের মাত্রাসংখ্যা হলো চোদ্দ। এর ছন্দ বিভাগ হলো — ৩/২/২/৩/২/২ যেখানে তিনটি তালি আছে এবং তিনটি খালি আছে। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে এই তালের ভিন্ন ভিন্ন তাল বিভাগ প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে এই তালের বিভাজন করেছেন এইভাবে — ৩/২/২/৩/৪। হিন্দুস্থানী সংগীতে আভিজাত্যের দিক থেকে ধ্রুপদের পরেই আছে ধামারের স্থান এবং সাধারণত যে-কোনো শাস্ত্রীয় আসরে ধ্রুপদ গানের পরেই ধামার গান গাওয়া হয়। ধ্রুপদের বাণী অপেক্ষা ধামারের বাণীর ভারীত্ব কম এবং মূলত শৃঙ্গার রসের আধিক্য দেখা যায়। ধামার গানে বাঁটের কাজ খুব বেশি করা হয়ে থাকে, তাই এই গানের ছন্দবহুলতা খুব বেশি থাকে। তবে বাঁট ব্যবহারে গানের বাণীর অংশ খর্ব হবার কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধামার-অঙ্গের গানে বাঁটের ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছেন। সুরের কলাকৌশল গানের বাণীকে ঢেকে দেবে তা তিনি কখনোই চাইতেন না। তিনি বলেছেন —

"কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশেল বাড়িতেই থাকে। কেন না, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। এইজন্য ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে। সেখানে তানমানলয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হইয়া ওঠে, আসল গানটা ঝাপসা হইয়া থাকে। রসবোধের নাড়ি যখন ক্ষীণ হইয়া আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়াইয়া যায়,... এদেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল, তখন এমন সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই মিলিত গান গাওয়াই যাঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখন গানেরই খ্যাতি পাইত লড়াইয়ের নয়।"[৫]

তিনি তাঁর ধামার-অঙ্গের গানগুলি অনেকটাই সহজ সরল পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং গানগুলিতে মূলত শাস্ত্রীয় ধামারের অনুকরণ লক্ষ করা যায়। এখন রবীন্দ্রনাথের কিছু গানের উদাহরণ দেওয়া হলো, যেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে শাস্ত্রীয় ধামার সংগীতের প্রভাব তাঁর গানে কতটা পড়েছে —

রবীন্দ্রনাথের গান	মূল গান	রাগ	স্বরবিতান সংখ্যা
বীণা বাজাও হে	বীণ বাজায় রে	পূরবী	২৫
সুধা সাগর তীরে	আয়ো ফাগুন বড়ো মান নায়কী	কানাড়া	৪
হরষে জাগো আজি	হরষ জাগ লাল	হাম্বীর	২৭
অমৃত সাগরে	মৈ তো না জাঁউ	কামোদ	৩৬
আজি রাজ-আসনে	প্যারি তেরে গায়ন পকঁরু	বেহাগ	২৬
এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল	আজু ব্রজমেঁ	বাহার	২৬
কে রে ওই ডাকিছে	তারি ডফ বাজত	আলাইয়া	২৫
জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে	আজি রঙ্গা খেলত হোরি	বেহাগ	৩৬
ডাকিছ কে তুমি	হ্যাঁরে ডফ বাজন	খাম্বাজ	২২
মম অঞ্জানে স্বামী	আজ ব্রজমেঁ সৈঁইয়া	বাহার	২৫
সাজাব তোমারে হে	ভুলিসি গোবারণ	নটহাম্বীর	৩৫

খেয়াল-অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত:

খেয়াল শব্দটি হলো একটি পারসিক শব্দ। এর অর্থ হলো কল্পনা করা। খেয়াল গান কবে সৃষ্টি, আবির্ভাব বা প্রচলন হয়েছিল এবং কার দ্বারা হয়েছিল এই নিয়ে নানা মতপার্থক্য আছে। 'A Historical Study of Indian Music' গ্রন্থে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ খেয়াল গান নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার ভিত্তিতে খেয়াল গানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচলিত মতবাদগুলিকে এখানে তুলে ধরা হলো —

১। অনেকে মনে করেন, আমীর খসরুর বা আলাউউদ্দিন খিলজীর আগে থেকেই উত্তর ভারতে প্রচলিত কাওয়ালী বা কাবলী নামক একপ্রকার ধর্মসংগীত বা প্রেমসংগীত প্রচলিত ছিল, কাবল বা কাওয়াল নামক একশ্রেণির যাযাবর জাতির মধ্যে। এই সংগীত থেকেই খেয়াল গানের উৎপত্তি হয়।

২। কেউ কেউ মনে করেন, ১২শ বা ১৩শ শতকে তিন অঙ্গা বিশিষ্ট এবং তিন ধাতুবিশিষ্ট 'কৈবাড়ঃ' (kaivada) নামক একপ্রকার প্রবন্ধগীতি প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে খেয়াল গানে রূপান্তরিত হয়েছে।

৩। শুধু কৈবাড়ঃ' প্রবন্ধগীতিই নয় অনেকে মনে করেন, 'একতালি' (ekatali) এবং 'রাসক' (easak) প্রবন্ধগীতির প্রভাব আছে খেয়াল গানের উৎপত্তিতে।

৪। অনেকের মতে শাঙ্গাদেব বর্ণিত 'আক্ষিপ্তিকা' (aksiptika) গীত থেকেই খেয়ালের রূপায়ণ ঘটেছে।

৫। অনেকে মনে করেন মধ্যযুগে উত্তর ভারতে প্রচলিত পল্লীগীতি থেকে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ এই খেয়াল গানের স্রষ্টি করেছিলেন।

৬। কিছু পন্ডিতের মতে, ১৮শ শতকে নিয়ামত খাঁ প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রবন্ধগীতির কাঠামোয় এবং ভাষার সমন্বয়ে খেয়াল গানের প্রবর্তন করেন।

মোঘল শাসনের অন্তিম লগ্নে, খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে বাংলাদেশে খেয়াল গানের সুস্পষ্ট এবং পরিশীলিত রূপ সকলের চোখে পড়ে। তখন দিল্লীর রাজদরবার থেকে বিচ্যুত হয়ে ওস্তাদেরা ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েন। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ শ্রেণির গানের সঙ্গো সঙ্গোই বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী খেয়ালেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে তৎকালীন বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী খেয়াল অপেক্ষা হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ সংগীতের সম্মান ও প্রচলন অনেক বেশি ছিল; বিশেষত কলকাতা, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে। বিষ্ণুপুরে যেখানে ধ্রুপদ সংগীতের একটি নির্দিষ্ট ঘরানা ছিল সেখানেও খেয়াল গানের চর্চা হতো। ওখানকার গায়কদের মধ্যে কিছুজন খেয়াল গানে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

© Santiniketan Sahityapath

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে খেয়াল গান অপেক্ষা ধ্রুপদ গানের প্রচলন বেশি ছিল। তবে খেয়াল গানের চর্চা যে ঠাকুরবাড়িতে একেবারেই ছিল না, তা নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিখ্যাত ওস্তাদদের আগমন ঘটত ঠাকুরবাড়িতে। তাঁরা ধ্রুপদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল গানও পরিবেশন করতেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী খেয়াল অপেক্ষা ধ্রুপদ গান বেশি পছন্দ করতেন কারণ খেয়াল গানে দুটি তুক থাকে — স্থায়ী এবং অন্তরা। কিন্তু বেশিরভাগ ধ্রুপদ গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চারটি তুকই থাকে। একটা সময়ে বাংলাদেশে খেয়াল গানের যে প্লাবন আসে তাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই তাঁর সংগীত সৃষ্টিতে হিন্দুস্থানী খেয়ালের প্রভাব অনেক গানেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী খেয়াল পদ্ধতির তাল যেমন — ত্রিতাল, একতাল, যৎ প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন তাঁর খেয়ালাঙ্গের গানে। তবে, অলংকার ব্যবহারের দিক থেকে হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খেয়ালাঙ্গ গানের অনেক পার্থক্য আছে। আগেই বলেছি অলংকার যেহেতু ভাষাকে খর্ব করে তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্রুপদ অঙ্গ এবং খেয়াল-অঙ্গ গানে অলংকার ব্যবহার পরিহার করেছেন। হিন্দুস্থানী খেয়ালের তান, বোলতান, বিস্তার ইত্যাদি বর্জন করেছেন। তবে মীড়, গমক ইত্যাদির অল্প স্বল্প ব্যবহার আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "যথার্থ আর্টের মধ্যে সহজ প্রাণ আছে বলেই তার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে; কিন্তু যেহেতু কারুনৈপুণ্যতা অলংকার, যেহেতু তাতে প্রাণের ধর্ম নেই, তাই তাকে প্রবল হতে দিলেই আভরণ হয়ে উঠে শৃঙ্খল, তখন সে আর্টের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বন্ধ করে দেয় তার গতি রোধ করে। তখন যেটা বাহাদুরি করতে থাকে সেটা আত্মিক নয়, সেটা বৈষয়িক; অর্থাৎ তার মধ্যে প্রাণগত বৃদ্ধি নেই, বস্তুগত সঞ্চয় আছে। তাই আমাদের হিন্দুস্থানী গানে বৃদ্ধি দেখতে পাই নে। তানসেন প্রভৃতির অক্ষয় কমণ্ডুল থেকে যে ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, ওস্তাদ প্রভৃতি জহ্নুমুনি কার্দানী দিয়ে সেটি গিলে খেয়ে বসে আছে। মোট কথা সত্যের রসরূপটি সুন্দর ও সরল প্রকাশ করা যে কলাবিদ্যার কাজ, অবাস্তবের জঞ্জাল তার সব চেয়ে শত্রু। মহারণ্যের শ্বাস রুদ্ধ করে দেয় মহাজঞ্জাল।... মানুষ বারবার শিশু হয়ে জন্মায় বলেই সত্যের সংস্কারবর্জিত সরলরূপে আদর্শ চিরন্তন হয়ে আছে; আর্টকেও তেমনি শিশুজন্ম নিয়ে অতি-অলঙ্কারের বন্ধনপাশ থেকে বারে বারে মুক্তি পেতে হবে।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেশ কিছু গানে খেয়াল গানের অনুকরণ করেছেন, আবার কোথাও কোথাও স্বকীয় প্রতিভায় কিছু গান রচিত হয়েছে যেখানে নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে, ভাব ও ভাষা সৃষ্টিতে এবং সুরসংযোজনে। এখন শাস্ত্রীয় খেয়াল প্রভাবিত কিছু রবীন্দ্রসংগীতের উল্লেখ করা হলো —

রবীন্দ্রনাথের গান	মূল গান	রাগ	স্বরবিতান সংখ্যা
ত্রিতাল:			
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে	লাগি মোরে ঠুমক	মিশ্র মালকোষ	৪৫
আঁখিজল মুছাইলে জননী	জিন ছুঁয়ো মোরে	রামকেলী	১১
এ কী এ সুন্দর শোভা	বাজুরে মন্দর বাজু	মিশ্র ভূপালী	২৩
ডাকে বারবার ডাকে	মোহে কৈসে নিকি লাগি	কেদারা	৩৬
তব প্রেম সুধারসে মেতেছি	কারি কারি কমরিয়া গরজী	পরজ	২৬
নব আনন্দে জাগো আজি	অধর ধরে বন বাঁশরী	গুর্জরী টোড়ী	২৪
মন, জাগ' মঙ্গলালোকে	জাগো মোহন প্যারে	ভৈঁরো	২৭
আজ বুঝি আইল প্রিয়তম	ফুল রহি কলিয়া মধুবন	সাহানা	২৫
আজি মম জীবনে নামিছে	অব মেরি পায়েলা বাজনু	আড়ানা	২৪
এই বেলা সবে মিলে	চতুরঙ্গা রস সন	ইমনকল্যাণ	৪৯
দাও হে হৃদয় ভরে দাও	প্যালা মুঝে ভরি দেরে	রামকেলী	৪৫
রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে	মুরলিয়া ইহ না, বাজাও শ্যাম	খাম্বাজ	২৭
রাখো রাখো রে জীবনে	জাননা দোহি এরি মা	শ্যাম	৩৬
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে	রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি	মল্লার	১১

 © Santiniketan Sahityapath

একতাল:

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে	আজ শ্যাম মোহলিয়ে	খাম্বাজ	৪
নয়ান ভাসিল জলে	পাপিহা বোলেরে	শ্যাম	১১
মন্দিরে মন কে	সুন্দর লাগি রহে	আড়ানা	৪
মোরে বারে বারে ফিরালে	মোরে নয়ি লগন লাগিরে	নটমল্লার	২৪

অন্যান্য তাল:

আজি মোর দ্বারে	হো হো মোরে দ্বার	দেশ (পঞ্চম সোয়ারী)	৩৫
হে মন, তারে দেখো	এ মনকে আঁখ	বিলাবল (রূপক)	২৪
একী হরষে হেরি কাননে	মনকী কমল দল খোঁলিয়া	মিশ্রবাহার (আড়াঠেকা)	৩৫

শাস্ত্রীয় খেয়াল অনুসৃত এই গানগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আরো অনেক গান সৃষ্টি করেছেন যেখানে রাগের আধার থাকলেও, তাঁর স্বকীয় সৃজনপ্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে। সেই গানগুলির উল্লেখও এখানে করা হলো —

রবীন্দ্রনাথের গান	রাগ	স্বরবিতান সংখ্যা
ত্রিতাল:		
অনেক দিয়েছ নাথ	আশাবরী	৪
আজি এই গন্ধ বিধুর সমীরণে	পরজ বসন্ত	১০
এবার নীরব করে দাও হে	কানাড়া	৩৭
ঘোর দুঃখে জাগিনু	বিভাস	৩৬
ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে	পরজ	৪
তিমির দুয়ার খোলা	মিশ্র রামকেলী	৩৬
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে	মিশ্র রামকেলী	২৬
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে	বেহাগ	৪
মনে যে আশা লয়ে	মেঘাবলি	৮
একতালঃ		
কী গাব আমি, কী শুনাব	মিশ্র-কানাড়া	৪
অল্প লইয়া থাকি তাই	মিশ্র ছায়ানট	৪
অশ্রুনদীর সুদূর পারে	পূরবী	১৬
আমি কেমন করিয়া জানাব	মিশ্র আশাবরী	২৪
কে গো অন্তরতর সে	ইমন	৪০
কোন্ শুভক্ষনে উদিবে	বেহাগ	২৬
জগতে আনন্দজজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ	সরফর্দা	২৭
তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম	বেহাগ	১০
ধনে জনে আছি জড়ায়ে	সিন্ধুরা খাম্বাজ	৩৭
নিভৃত প্রাণের দেবতা	পূরবী	৩৮
প্রভু আমার, প্রিয় আমার	কেদারা	৩৬
যতবার আলো জ্বালাতে চাই	কামোদ	৩৮
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে	পিলু	৪০
সীমার মাঝে অসীম, তুমি	ছায়ানট	৩৭

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই		মিশ্র পরজ	৩৬

অন্যান্য তাল:

কেন জাগে না অবশ পরাণ	বেহাগ	যৎ	২৬
কত অজানারে জানাইলে তুমি	মিশ্র হাম্বীর	রূপকড়া	২৬
তোমার প্রেমে ধন্য করো	মিশ্র সারং	তেওড়া	১৩
প্রেমে প্রেমে গানে গন্ধে	মিশ্র টোড়ী	নবতাল	২৬

টপ্পা অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত:

অনেকে মনে করেন যে টপ্পা পাঞ্জাবের গীতশৈলী, ওখানকার উষ্ট্রচালকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালে নানান রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়ালের মতন টপ্পাও শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্তর্গত একটি অনুশীলিত ধারা। অনেকে মনে করেন ঠুংরীগানের অনেক আগেই টপ্পার উদ্ভব হয়েছে। এই টপ্পা গানকে ক্লাসিক্যাল পর্যায়ে উন্নীত করেন অযোধ্যা-নিবাসী ওস্তাদ গোলাম নবী। তিনি তাঁর স্বীয় প্রতিভায় প্রাচীন টপ্পার সঙ্গে বিভিন্ন অলংকার যুক্ত করেন। এই সময় থেকেই টপ্পা গানের অগ্রগতি শুরু হয়। তিনি তাঁর গানের ভণিতায় শোরী নামের উল্লেখ করতেন, যে কারণে তাঁর গান শৌরী মিয়াঁর টপ্পা নামে পরিচিত ছিল। তবে, এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। তবে, প্রকৃতপক্ষে গোলাম নবীর কৃতিত্বের কারণেই টপ্পা শাস্ত্রীয় সংগীতে সংযোজিত হয়। পাঞ্জাবী ভাষা টপ্পা গানে সাধারণত বেশি ব্যাবহার হয়। এই গানের মূল বিশেষত্ব হলো ‘জমজমা’ নামক একপ্রকার তানের ব্যাবহার, এছাড়া ‘গিটকারীর’ ব্যবহারও হয়ে থাকে। টপ্পা গান সাধারণত খাম্বাজ, কাফী, পিলু, ভৈরবী ইত্যাদি রাগে গাওয়া হয়ে থাকে।

টপ্পা গানের ব্যবহার বাংলাদেশে ধ্রুপদ ও খেয়াল চর্চার সময় থেকেই প্রচলিত ছিল। বাংলায় টপ্পা গান প্রবর্তন করেন নিধুবাবু অর্থাৎ রামনিধি গুপ্ত। শোনা যায় কর্মসূত্রে ছাপড়ায় থাকাকালীন তিনি অনেক বড়ো বড়ো ওস্তাদদের কাছ থেকে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি হিন্দুস্থানী গানের তালিম নিয়েছিলেন। এরপর তিনি ফিরে এসে কলকাতায় নতুন ধরণের এক বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তন করেন। মূল হিন্দুস্থানী টপ্পার প্রভাবে সৃষ্টি হলেও নিধুবাবুর টপ্পার রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন — “Specially Ramnidhi Gupta brought a renaissance in the classico-Bengali songs by composing and improvising new type of tappa, and from this it can be presumed that tappa was introduced in Bengal earlier than Hindusthani Kheyal and that Bengal of the 18th-19th century had her full share of the legacy of traditional music; which came to be known as the aristocratic vaithaki sangita.”[৭] অনেকটা বাংলাদেশের মনমেজাজ এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই টপ্পা গড়ে উঠেছিল বলে তাঁর এই গান ‘বাংলা-টপ্পা’ নামে সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেছিল। নিধুবাবুর পরে আরো অনেকে তাঁর টপ্পার অনুকারী হয়েছিলেন, যেমন — শ্রীধর কথক, রামনিধি গুপ্ত, রাম বসু প্রমুখ। নিধুবাবুর টপ্পা গানের মর্যাদা ঠাকুরবাড়িতে যথেষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথও এই গান খুব পছন্দ করতেন। ইন্দিরাদেবীর মতে রবীন্দ্রনাথ নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রাম বসু প্রমুখের গান করতেন। সেই কারণে রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টিতে এই টপ্পা গানের প্রভাব পড়বে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এখানে শ্রীধর কথকের একটি গানের উল্লেখ করব যে গানটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এই গানটি সিন্ধু কাফি রাগে এবং আড়াঠেকা তালে নিবন্ধ —

“যে যাতনা যতনে মনে মনই জানে।
পাছে লোকে হাসে শুনে, যেমন লাজে প্রকাশ করিনে।।
প্রথম মিলনা বিধি যেন কত অপরাধী —
নিরবধি সাধি প্রাণপণে।
তবু তো সে নাহি তো সে, আরো দোষে অকারণে।।”[৮]

হিন্দুস্থানী টপ্পা গানের প্রচলন ছিল ঠাকুরবাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু টপ্পা অঙ্গের গান রচনা করেছেন যেখানে সৌরী মিয়াঁর টপ্পাকে তিনি অনুকরণ বা অনুসরণ করেছেন। তবে এখানেও তাঁর স্বকীয়তা প্রকাশ করেছেন রচনাভঙ্গি ও পরিবেশন রীতির দিক থেকে। এই গানগুলি সৃষ্টিতেও হিন্দুস্থানী টপ্পার প্রভাব আছে। তিনি টপ্পা রীতির গানে ব্যবহৃত মধ্যমান, আড়াঠেকা, তেওড়া প্রভৃতি

© Santiniketan Sahityapath

তালের ব্যবহারই করেছেন তাঁর নিজস্ব টপ্পা-অঙ্গের গানে। তবে, তিনি শাস্ত্রীয় টপ্পার তান, বোলতান প্রভৃতি অলংকরণ বাদ দিয়েছেন। শুধুমাত্র জমজমার কাজ এবং অল্প পরিমাণে গিটকারীর কাজ ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে। টপ্পা গীতরীতির দ্বারা যে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেরকমই কিছু টপ্পা-অঙ্গের গানের উল্লেখ করা হলো —

রবীন্দ্রনাথের গান	মূল গান	রাগ	তাল	স্বরবিতান সংখ্যা
এ পরবাসে রবে কে	ও মিঞা বেজনুওয়ালে	সিন্ধু	মধ্যমান	৮
আইল আজি প্রাণ সখা	খোল তব ঘুঁঘট	কেদারা	আড়াঠেকা	৫৬
এ কী করুণা, করুণাময়	নইরে মা বরণ	বাহার	আড়াঠেকা	৪
কে বসিলে আজি	বে পরিয়া তাঁতে	সিন্ধু	মধ্যমান	৪৫
হৃদয় বেদনা বহিয়া	———	সিন্ধু	তেওরা	২৫
বন্ধু রহো রহো সাথে	সঙ্গো চলা, দিয়া, হাওয়ে	ভৈরবী	———	২

মূল হিন্দুস্থানী টপ্পা গানের অনুসরণ করা ছাড়াও অনেক টপ্পা প্রকৃতির গানে রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। এমন কিছু গানের উদাহরণ হলো —

রবীন্দ্রনাথের গান	স্বরবিতান সংখ্যা
অন্ধজনে দেহ আলো	২৭
আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না	৪২
তবু মনে রেখো	৫০
তোমায় নতুন করে পাবো বলে	৭
সার্থক জনম আমার	৮
পথ চেয়ে যে কেটে গেল	৪৪
ও চাঁদ চোখের জলের	১
কী রাগিণী বাজালে	১০
কিছুই তো হলো না	৩৫
অনন্ত সাগর মাঝে	৮
আজি যে রজনী যায়	৩৫
আর কেন, আর কেন	৪৮
আরো আঘাত সইবে আমার	৩৭
আহা তোমার সঙ্গো প্রাণের খেলা	৪২
কখন বসন্ত গেল	৩২
কী করিনু হায়	২৯

রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-অঙ্গের গানগুলির কথা ও সুরকে খুব ভালো করে অনুধাবন করলে আমরা এই গানগুলির একটি বিশেষ মার্জিত রূপের পরিচয় পাই। এই প্রসঙ্গো প্রফুল্লকুমার দাস বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-অঙ্গের গানে জম্‌জমা অলংকরণের প্রাবল্য বা সুরের সামান্য হেরফেরে একই কথার পুনরাবৃত্তির আধিক্য নেই। এরূপ অলংকরণ আধিক্যের ফলে রাগ সংগীতের ক্ষেত্রে টপ্পা গানে কিঞ্চিদধিক কাঠিন্য, নীরসতা ও একঘেয়েমি আনে। অন্য দিকে উচ্চ ভাবাদর্শ রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। টপ্পা অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীতও তার ব্যতিক্রম নয়। এমন-কি, প্রেম পর্যায়ের গানগুলিতেও নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যাক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।"[৯]

ঠুংরী-অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত:

© Santiniketan Sahityapath

খেয়াল গানের উদ্ভব হবার অনেক পরেই ঠুংরী গানের সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। তবে নিশ্চিতভাবে এই সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। কারোর কারোর মতে ভারতের খেয়াল ধারার গায়কেরাই ঠুংরী গান সৃষ্টি করেছেন। এই ঠুংরী গানের বিষয়বস্তু মূলত প্রেম বিষয়ক বা শৃঙ্গার রসাত্মক হয়ে থাকে। খুবই সংক্ষিপ্ত এই গান হোরী বা হোলী উৎসবে গাওয়া হয়ে থাকে। ঠুংরী গানে কোনো একটি বিশেষ রাগরূপ রক্ষা করা হয় না, বরং বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ ঘটানো হয়, যেখানে শিল্পীর কুশলতা প্রকাশেরও অবকাশ থাকে। এই গানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুরবিন্যাসের কাজ থাকে, তবে তানের প্রাধান্য কম থাকে। মুড়কী, গিটকারী ইত্যাদি অলংকার পরিবেশনের তারতম্য অনুযায়ী ধ্রুপদ এবং খেয়ালের মতো ঠুংরীরও কিছু ঘরানা দেখা যায়। সেগুলি হলো — লক্ষ্ণৌ ঘরানা, বেনারসী ঘরানা, পাঞ্জাব ঘরানা। বাংলার প্রখ্যাত সংগীততত্ত্ববিদ্ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গীতিসূত্রসার' গ্রন্থে ঠুংরীগান সম্পর্কে বলেছেন — "যে সকল গান টপ্পার রাগিণীতে এবং আদ্ধা কাওয়ালী ও ঠুংরী তালে গীত হয় তাহাকে ঠুংরী গান কহে। কাপ্তান উইলিয়ড সাহেব, ঠুংরী নামক পৃথক রাগ আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুস্থানে ঠুংরী নামে একজাতীয় গান প্রচলিত আছে; তাহা নানাবিধ রাগে গীত হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে ঠুংরী গানের অতিশয় আদর হয়,.. অনেকের বিশ্বাস যে শৌরী, ঠুংরী রাগের না হউক, ঠুংরী গান প্রণালীর উদ্ভাবক।... এরূপ বিশ্বাস হয় যে, শোরীর টপ্পা আরো সংক্ষেপে করিয়া লওয়াতে, তাহা হইতে ঠুংরী গানের উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দুস্থানের তরফাওয়ালী গায়িকারা ঠুংরী গান সর্বদা গাহিয়া থাকে; এইজন্য কগাবৎ ওস্তাদেরা ঠুংরী গানকে অতিশয় ঘৃণা করেন... ঠুংরী গানের সুর পর্যালোচনা করিলে, ইহার দুইটি সৌন্দর্য দেখা যায়ঃ একটি গাইবার রীতি, অপরটা বিচিত্রিতা।... ঠুংরী সুরে বিচিত্রতার তাৎপর্য এই যে, ইহার কলেবর যেরূপ সংক্ষেপ, তাহার তুলনায় ইহাতে বিচিত্রতা অধিক। সেই বিচিত্রতাকে চলতি কথায় 'জংলা' বলে, অর্থাৎ এক গানের একই কলিতে দুই তিন রাগের সংযোগ। এইরূপ আশ্চর্য কৌশলে ওই যোগ সম্পাদিত হয় যে, তজ্জন্য উহা অসংগত শোনায় না।... সংগীতানভিজ্ঞ লোক, উহার কোন স্থানে কোন রাগ লাগিতেছে, তাহা কখনোই বুঝিতে পারে না। 'ঠুংরী গানের কয়েকপ্রকার ভেদ আছে, যথা — খেমটা, কাহারবা, দাদরা ইত্যাদি। খেমটা, ভরঙ্গা, কাহারবা প্রভৃতি তালে ওইসকল গান গাওয়া হয়ে থাকে। তজ্জন্যই উহাদের ঐপ্রকার নাম হইয়াছে।"[১০]

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়াজেদ আলি খাঁ কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর দরবারে সেই সময় ঠুংরী গানের প্রচলন ছিল যদিও এই গানকে বাংলার সংগীত সমাজ খুব সহজে গ্রহণ করেনি। ঠাকুরবাড়িতেও এই ঠুংরীর চর্চা তেমন ছিল না, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও না। আসলে এই গানে সুরের প্রাধান্য বেশি এবং বাণী বা কথার প্রাধান্য কম থাকায় তা রবীন্দ্রনাথকে হয়ত তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই ঠুংরী প্রভাবিত রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা অনেক কম। তবে তিনি কিছু কিছু ঠুংরী-অঙ্গের গান তিনি রচনা করেছেন যেখানে ঠুংরীর সূক্ষ্ম সুরবিস্তারের পদ্ধতিকে ব্যাবহার করেছেন। এখন রবীন্দ্রনাথের ঠুংরী অঙ্গের গানের উদাহরণ দেওয়া হলো —

রবীন্দ্রনাথের গান	মূলগান	রাগ	তাল	স্বরবিতান
তুমি কিছু দিয়ে যাও	কই কছু কহরে	খাম্বাজ	কার্ফা	৫
এরা পরকে আপন করে	পিলু বারোয়াঁ	খেমটা		২৮
কী সুর বাজে আমার প্রাণে	পিলু	যৎ		৩৬
খেলার সাথি বিদায় দ্বার খোল	মহারাজা	কেবড়িয়া	—	—

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মুক্ত মনের একজন মানুষ, যিনি সংগীতের যে ধারার সংস্পর্শে এসেছেন তার দ্বারাই কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সংগীত সৃষ্টির প্রথম দিকে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারাকে অনুকরণ করেছেন, অনুসরণ করেছেন। কিন্তু অনেক গান এমনও সৃষ্টি করেছেন যা শাস্ত্রীয় নিয়মের অনুশাসন থেকে মুক্ত। আসলে রবীন্দ্রনাথ কখনো বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন নি, বরং নিজের স্বকীয়তাকে উন্মুক্ত করেছেন, তিনি গ্রহণ করেছেন আবার বর্জনও করেছেন। তবে শাস্ত্রীয় বিভিন্ন ধারাগুলোর আলোচনা শেষে আমরা একটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত ধারাগুলোর মধ্যে ধ্রুপদকেই সব থেকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এর বাণী ও সুরের সমান প্রাধান্যের জন্য। বাণীকে অবহেলা করে ঢেকে দিয়ে সুরের পালোয়ানী করাকে তিনি কোনোদিন গুরুত্ব দেননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি দিয়ে আমার এই নিবন্ধের আলোচনার পরিসমাপ্তি করব। রবীন্দ্রনাথের উক্তি — "তোমাদের ওখানে গানের মজলিসে ছায়ানট গাওয়া হয়েছিল।... ছায়ানটের যত রূপ-রূপান্তর আছে, তান-কর্তব সারেগম, যত রকম লয়ে-বিলয়ে তাকে উল্টানো পাল্টানো যেতে পারে তার কিছুই বাদ পড়েনি। আমার অভিমত কী জানতে চাও,... Art is never an exhibition but a

revelation... বস্তুত ছায়ানটের ব্যাপক প্রদর্শনী আর্ট নয় — বিশেষ গানে বিশেষ সংযমে বিশেষ রূপের সীমাতেই ছায়ানট আর্ট হতে পারে, সে রূপটাকে তানে কর্তব্যে তুলো ধুনা দিতে থাকলে বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়ের সেটা যতই ভাল লাগুক না, আমি তাকে আর্টের শ্রেণীতে গণ্যই করব না।”[১১]

তথ্যসূত্র:

১। ‘আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস’, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, কলিকাতা, পৃ. ১২

২। ‘রবীন্দ্র সংগীত’, প্রিয়ব্রত চৌধুরী, জেনারেল বুকস, কালীতলা লেন, হাওড়া, পৃ. ১২১

৩। ওই, পৃ. ১২০-১২১

৪। ওই, পৃ. ১২১

৫। ওই, পৃ. ১২৩

৬। ‘সংগীতচিন্তা’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ২০৩-২০৪

৭। ‘ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সংগীত’, দ্বিতীয় খণ্ড, উৎপলা গোস্বামী, চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ১৫১

৮। ‘রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ’, অখণ্ড সংস্করণ, প্রফুল্লকুমার দাস, জিজ্ঞাসা পাব্লিসিং হাউস, কলকাতা, জানুআরি, ২০১৯, পৃ. ২৩৫

৯। ওই, পৃ. ২৩৮

১০। ‘রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা’, শান্তিদেব ঘোষ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ. ১৩৬-১৩৭

১১। ‘রবীন্দ্র সংগীত’, প্রিয়ব্রত চৌধুরী, জেনারেল বুকস, কালীতলা লেন, হাওড়া, পৃ. ১২৩

—

Prantik Gabeshana Patrika

 © Santiniketan Sahityapath